নারী দিবসের ব্যস্ততা

আজ সকাল থেকেই রেহানা সুলতানা খুব ব্যস্ত। আজকে ৮ই মার্চ নারী দিবস, সে উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, তাদের সংগঠন 'নারীকেন্দ্র' ও এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সেমিনার ও বিরাট শোভাযাত্রা'র আয়োজন করেছে। নারীকেন্দ্রের আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'মেয়েদের অধিকার, আইন ও তার বাস্তবায়ন'। সেমিনারের প্রধান বক্তা আবার রেহানা সুলতানা নিজেই। তো ব্যস্ত থাকবেন না তিনি। নিজের পেপার রেডী করা, গন্যমান্য ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করেছেন, তাদের নিজে যেয়ে আমন্ত্রন করেছেন, শোভাযাত্রার থীম ঠিক করেছেন, সবকিছু একদম নিখুত হওয়া চাই, সবার থেকে আলাদাতো হবেই আর নতুনও হতে হবে। পুরনো আইডিয়া আবার তার পছন্দ না। সবকিছু এ্যরেঞ্জ করা এগুলো কি কম ঝক্কির ব্যাপার? এমনিতেও নারীকেন্দ্রের সহপরিচালিকা হিসবে তাকে মোটামুটি সবসময় ব্যস্তই থাকতে হয়। সেমিনার, মিটিংতো হরদম লেগেই থাকে, অনেক সময়তো দেখা যায় পরপর কদিন অফিসেই যেতে পারেন না। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা পুরোটা তিনি প্রাইভেট টিউটরদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, আজকাল আর সময় পান না তেমন, মাঝে মাঝেতো রাতে খাবার টেবিল ছাড়া ওদের সাথে দেখাই হয় না। নিজেও তখন এতো ক্লান্ত থাকেন যে কোন রকমে খেয়ে, রাতের প্রসাধনটা সেরেই এসি ছেড়ে শুয়ে পড়েন। টিভিতে হিন্দী সিরিয়াল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। নিজের কাজ নিয়েই এতো ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে যে সংসারের অন্যদিক দেখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। শাশুড়ির হাতেই মোটামুটি সংসারের নিত্যদিনের দ্বায়িত্ব দেয়া আছে যদিও মূল চাবিকাঠি তার নিজের কাছে। রোজের বাজার, খুচরো কাজ, কাজের লোকের দ্বায়িত্ব শাশুড়ির কাছে দেয়া আছে, এসবের জন্য এর চেয়ে বিশ্বস্ত কাজের লোক এ বাজারে আর কোথায় মিলবে। সেজন্যই শাশুড়িকে বাসায় রাখা নইলে কবে দূর দূর করে গ্রামে রেখে আসতেন। গ্রাম্য স্বভাবের পান চিবানো এই ভদ্রমহিলাকে আগে থেকেই তিনি পছন্দ করেন না, কারণে অকারনে যেখানে সেখানে নাক গলিয়ে তার গ্রাম্য ভাষায় যত রকমের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়া কথা। তবে কথার পরিমান রেহানা সুলতানা আগের থেকে আজকাল অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন, কাজের কথা ছাড়া কথা একদম বন্ধ প্রায় বললেই হয়। স্বামীকেও টু শব্দ করার সুযোগ দেন না তিনি ঘরের ব্যাপারে, তিনি যা বলবেন সেটাই তার সংসারে শেষ কথা। তার স্বামী অবশ্য তাকে ঘাটাতে সাহসও করেন না। সালাম সাহেব তার অফিস, রাতের পার্টি নিয়ে তার মতো ভালো আছেন। তবে রেহানা সুলতানার কোন কাজ থাকলে তিনি খুব যত্ন নিয়ে তা করে দেন, বিরাট সরকারী চাকুরী করেন সালাম সাহেব, প্রায় সব বিভাগেই তার প্রভাব আছে, লোকজন তার কথা ফেলতে পারেন না। রেহানা সুলতানার এটা বিরাট সুবিধা, তার 'নারীকেন্দ্রে'র অনেক কাজই প্রায় বিনা সমস্যায় সালাম সাহেবের সুবাদে হয়ে যায়, সেজন্যই তিনি সহপরিচালিকার মর্যাদা পান যদিও তিনি স্বামীকে তা ঘুনাক্ষরেও টের পেতে দেন না, নিজের দাপট সবসময়ই বজায় রাখেন। সংসারে আর কার্যক্ষেত্রে সব জায়গায় তার দাপটে সবাই প্রায় টটস্থ থাকে। সবকিছুকে কি করে নিজের অধীনে রাখতে হয় সেটা রেহানা সুলতানা ভালোই জানেন।

এমনিতে রেহানা সুলতানার সংসার ও জীবন মোটামুটি বেশ গোছানোই ছিল কিন্তু গোল বাধায় তার বেয়ারা মেয়েটা। শাশুড়ির সাথে কথা বলার সময় এসে টকাস টকাস করে চারখানা কথা হয়তো তাকেই শুনিয়ে গেলো, মজা করার ছলে তাকেই খুচিয়ে গেলো হয়তো। এমনিতে দাদীর সাথে ভাবও বেশ। দাদীর পাশে শুয়ে শুয়ে ওই পান চিবানো মুখের গ্রাম্য গল্প দেখা যায় খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে আবার মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আবার দাদীর সাথে খুনসুটিও হয় দেখি, দাদীর আশকারাতেই কি মায়ের সাথে এধরনের বেয়াদপি হয় কিনা বুঝতে পারেন না রেহানা সুলতানা। শাশুড়িতো তাকে আজকাল বেশ সমঝেই চলেন তাহলে টিয়ানা এতো সাহস পায় কোথায়? নিজের আত্মজা না হলে কি অবস্থা করতেন রেহানা সুলতানা নিজেও জানেন না কিন্তু হাত উঠাতে যেয়েও মাঝে মাঝে থেমে যান তিনি, এরপর কি করবে এই মেয়ে সেই কথা ভেবে। মেয়েতো নয় যেনো গোখরো সাপ। আজকাল টিয়ানা বড্ড দেরী করে বাড়ি ফিরে, রোজ বাইরে যায় শাশুড়ি সেদিন বলছিলেন, ভীষন উগ্র হয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কেনো? যা চাইছে তাইতো দিচ্ছেন তিনি, তাহলে ওর সমস্যাটা

কোথায়? টিয়ানার সাথে কথা বলবেন, ভাবছেন অনেকদিন ধরে, বোঝাতে হবে ওকে, কিন্তু সময়ই মেলাতে পারছেন না। এইতো সেদিনই দেখলেন জীনস আর শর্টটপস পড়া টিয়ানা বেশ কতোগুলো অদ্ভুদ বেশ-ভুষায় দেখতে ছেলের সাথে ফাস্ট ফুডের শপ থেকে বের হলো, একটি ছেলে আবার কায়দা করে টিয়ানার কোমরে হাত রেখেছে। দেখা মাত্র মাথায় আগুন জ্বলে গেলো রেহানা সুলতানার কিন্তু তিনি তখন একটি জরুরী মিটিং এ যাচ্ছিলেন। তাছাড়া রাস্তায় সীন ক্রিয়েট করার সাহসও হলো না, নিজের মেয়েইতো বশে নেই। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে টিয়ানাকে ওই ছেলের কথা জিজ্ঞেস করা মাত্র ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া টিয়ানা ঘাড় ত্যাড়া করে পুরো সাহেবী কায়দায় তাকে বললো, 'হোয়াটস ইউর প্রব মম', হোয়াই ডু ইউ বদার'? ইচ্ছে করছিলো ওই ঘাড়ে ঝোলানো পোনিটেল টেনে নীচে শুইয়ে ফেলে কিন্তু টিয়ানার চোখ দেখে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেলো। টিয়ানার সাথে তার বাদানুবাদের প্রায় প্রত্যেক সময়ই গলার রগ ফুলিয়ে বলে সে, 'মম, বাপি আর গ্র্যানীর কাছে যা পারো আমার সাথে সে চেষ্টাও করো না।' আজকাল মাঝে সাঝে দেখেন চোখ- মুখ কেমন যেনো টিয়ানার, ঘুমের কোন ঠিক নেই, খাবারে কোন রুচি নেই, না খেয়েই মেয়ে উঠে যাচ্ছে। ঘুমুচ্ছেতো পড়ে পড়ে সারা বেলা হয়তো ঘুমাচ্ছেই। অনেক সম্ভাবনার কথাই মাথায় আসে মাঝে মাঝে, গভীর ভাবে ভাবলে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে, ওইসব ট্যাবলেট, ড্রাগসতো আজকাল হাতের কাছেই পাওয়া যায় অনেক দোকানে। কি করছে তার মেয়ে, কাদের সাথে মিশছে, কেনো? কি পায়নি তার মেয়ে নাকি সবকিছু হাতের কাছে পেয়ে যাওয়াই তাকে অবাধ্য করে তুলছে। মম - বাপি কিংবা ছোট ভাইয়ের প্রতি তার কোন আকর্ষন নেই সারাক্ষন সে ব্যস্ত তার পার্টি, ডিসকো, পিকনিক আর হইচই নিয়ে। ভীষন ডোন্ট কেয়ার মনোভাব তার আজকাল। এক সময় রিনিরিনে মিষ্টি গলায় কথা বলা টিয়ানা আজকাল কর্কশ গলা ছাড়া কথাই বলে না, এক সময় ক্লাশে ফার্স্ট হওয়া টিয়ানা আজ শুধু কোন রকমে টেনে হিচড়ে ক্লাশ ডিঙ্গাচ্ছে। কি চায় টিয়ানা রেহানা সুলতানা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কেনো বখে যাচ্ছে মেয়েটা?

রেহানা সুলতানার আজ সকালে বেরোনোর ভীষন তাড়া ছিল কিন্তু ড্রাইভার জলিলের কোন দেখাই নেই আজকে। এমনিতে সব সময় ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত থাকে জলিল কিন্তু বেছে বেছে আজকের এই শত কাজের দিনটিতেই তার দেরী। বারবার ইন্টারকমে ফ্ল্যাটের সিকিউরিটির কাছ থেকে খবর নিচ্ছেন জলিল এসে পৌছলো কি না। খুব অস্থির হয়ে তিনি ঘর আর বারান্দা করছেন। বাড়ির পাশেই ছোট বাচ্চাদের একটা স্কুল আছে, তাদের হল্লাগোল্লায় কান পাতা যাচ্ছে না, বিরক্তিটা চরমে উঠছে। অস্থিরতা কমাতে তিনি বুয়াকে বললেন এক কাপ চা দিতে, চা নিয়ে বসেছেন বটে কিন্তু আরো অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। ধানমন্ডির এদিকটাতে আজকাল এতো ভীড় আর জ্যাম যে আগে থেকে বেরিয়েও সময়মতো কোথাও পৌছানো যায় না আর আজতো দেরীই হচ্ছে, কখন যে পৌছবেন তিনি। তিনি না পৌছলে অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরী হবে, তার অফিসের সবাই হয়তো তার রাস্তা চেয়ে বসে আছে, একটু পর হয়তো মোবাইল বাজতে থাকবে। কি করবেন কি করবেন স্থির করতে পারছেন না। সিকিউরিটি থেকে কাউকে পাঠানো যায় অবশ্য একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে কিন্তু আজ তিনিই অনুষ্ঠানের মধ্যেমনি, তিনি যাবেন ট্যাক্সিতে তাও আবার বাসায় দু দুটো গাড়ি রেখে। বিশ বছরের পুরনো বিশ্বস্ত ড্রাইভার জলিল যে কোনদিন কাজে ফাকি দেয়নি দেরী করেনি আজকে হঠাৎ তার দেরী কেনো তিনি সে কথা ভাবছেন না, যে জলিল অসুখ নিয়েও কাজে চলে আসে, সে কোন খবর না দিয়ে কেনো এতো দেরী করছে সে ভাবনা ছাপিয়ে তার বিরক্তিই প্রধান হয়ে উঠছে। আজকাল পুরনো কাজের লোকের উপরও আর আস্থা রাখা যায় না। কাউকে যে পাঠাবেন খোজ নিতে সে উপায়ও নেই। জানেন এমনিতে পান্থপথের কাছে কোথাও বস্তিতে ঘর ভাড়া করে জলিল থাকে কিন্তু কোথায় সে খোজতো জানেন না। তাছাড়া উনি কাজের লোককে বেশী লাই দিতে চান না, লাই পেলেই ওরা মাথায় উঠবে, আজ এই সমস্যা, কাল ওই সমস্যা নিয়ে আসবে তাই দূরত্ব বজায় রাখেন আর কাজের লোকদেরও নিজেদের মধ্যে মেশামেশি করতে দেন না, তাহলেই এরা দল পাকাবে আর ঝামেলা শুরু হবে। মুখে বিরক্তির রেখা নিয়েই অবশেষে ভাবলেন সালাম সাহেবকেই ফোন করবেন, অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য, দেরী যখন হয়েই গেছে তখন আর কি করা। সালাম সাহেবকে ফোন করতে করতে ভাবলেন আজ আসুক জলিল তার একদিন কি ওর একদিন। কাল বলে দেয়া হয়েছে আজ যেনো ঠিক সময়মতো আসে সে। চেষ্টা করছেন না বিরক্ত হতে, মুখে বিরক্তির রেখা বসে গেলে ফটোটা হয়ত ততো ভালো আসবে না। আজকের দিনটাকে উপলক্ষ্য করে কি কম দৌড়াদৌড়ি হয়েছে রেহানা সুলতানার? শত ব্যস্ততার মাঝে গত রাতে পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল, ফেস পলিশ, ব্লীচ, সব করিয়ে এসেছেন, চুলের ডাইও ঠিক করে এসেছেন। আজকাল এতো মিডিয়ার প্রসার হয়েছে, টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, ক্যামেরায়

ক্যামেরায় সয়লাব। ভালো না দেখালে আবার মেয়ে রাগ করবে, আজকালকার মেয়েদের মুখও হয়েছে এতো আলগা, ফস করে যা মুখে আসবে বলে বসবে, গাল ফুলিয়ে থাকবে বন্ধুদের সামনে প্রেস্টিজ পাংচার বলে। অবশ্য রেহানা সুলতানার নিজের বন্ধুরাও বলবে, তাছাড়া নিজেরও খারাপ লাগবে। কাজ কি, মাসে মাসে তো যেতেই হয় পার্লারে তো এবার না হয় একটু তাড়াতাড়িই গেলেন। আজকালতো শিফন আর জর্জেটই পড়েন, কিন্তু নারী দিবসের সেমিনারকে কেন্দ্র করে বেলী রোডের বুটিক ঘুরে ঘুরে ভালো দেখে নিজের উজ্জল গায়ের রঙ্গের সাথে মিলিয়ে কালো জমিতে কমলা পাড় আর বুটির তাতের শাড়ি কিনেছেন, এইসব দিবসে টিবসে এ ধরনের শাড়ির ইমপ্যাক্টই বেশী হয়। জিম এ যেয়ে যেয়ে ফিগারটাও রেখেছেন দারুন। বয়সের ছাপ পড়তে দেননি চোখে-মুখে, শরীরের কোথাও। ফিগার দেখলে কে বলবে উনি চল্লিশের শেষ দিকে দাড়িয়ে আছেন? তিরিশের মাঝেই অবস্থান ধরে রেখেছেন, অন্তত তিনি তো তাই ভাবেন। খাওয়া - দাওয়াও দারুন কন্ট্রোল করেন, সব্জিই খাবার মেনুতে বেশী থাকে, তেল-ঘি কম দিয়ে। রান্নার লোককে ভালো করে বলেও দেয়া আছে সে কথা। শিফন আর জর্জেটে যতো ফিগার খোলে তাতের শাড়িতে তো আর তা না। কিন্তু কি লাভ হলো? কালকের সেই আয়োজনতো জলিলের ফাকির কারণে প্রায় বৃথাই যাচ্ছে।

রেহানা সুলতানা নির্ধারিত সময়ের প্রায় দেড় ঘন্টা পর সালাম সাহেবের অফিসের সরকারী গাড়িতে সভাস্থালে পৌছলেন। মোটামুটি তিনি সময় মতো সব জায়গায় যান তাই আজকে তার দেরী দেখে অনেকেই অবাক চোখে তাকালেন, মুখে ভদ্রতা করে বেশী কিছু বললেন না। যদিও রেহানা বেগম আগেই তার অফিসে ইনফর্ম করেছেন যে তার বেআক্কেল ড্রাইভারের জন্য তার এই দেরী। সভা আরম্ভ হওয়ার পর তার বকতৃতার সময় তার এই অনভিপ্রেত দেরীর জন্য তিনি অবশ্য সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। সভা চলছে খুব জোরেশোরে মূর্হুমুহু হাত তালি, গরম বকতৃতা, আমন্ত্রিত অতিথিরাও খুব ভালো বলছেন মেয়েদের অধিকারের উপর। শুধু আইন করলে আর অধিকারের কথা বললেইতো চলবে না তার বাস্তবায়নও হতে হবে আজকের সমাজে, সেই পরিবেশ তৈরী করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রেহানা সুলতানাতো ডাটাই দিয়ে দিলেন সারাদেশে গত বছর কতো মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে, কতোজন আইনী সাহায্য পেয়েছে এর মধ্যে নারীকেন্দ্র কতোজনকে সাহায্য দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শাড়ির খসখস, চুড়ির টুংটাং, মৃদ্যু হাসির শব্দ, টুকটাক খোশগল্প বেশ এক উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরী করেছে সভাকক্ষে। দুপুরে আমন্ত্রিত অতিথি আর নারীকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের জন্য ছিল ঢাকা ক্লাবের স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানী আর বোরহানী, কর্মচারীদের সাধারণ লাঞ্চ প্যাকেট। সবাই রেহানা সুলতানার আয়োজনের প্রশংসা করতে লাগলেন। দুপুরে দারুন উপভোগ্য এই সময়ের মাঝে টিয়ানার ফোন এলো মোবাইলে, জলিল এসেছে খবর দিতে। কাল রাতে জলিলের ষোল বছরের মেয়ে রফেজা আত্মহত্যা করেছে। টিয়ানা ফোনে রীতিমতো কাদছে আর বলছে রেহানা সুলতানাকে। রেহানা সুলতানা এসব আবেগে প্রচন্ড বিরক্ত হন, জলিলের মেয়ের মৃত্যু নিয়ে এতো কাদার কি আছে টিয়ানার? সবসময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে কাজ গুলো তিনি অপছন্দ করেন টিয়ানা বেছে বেছে সেই কাজগুলোই করে। সারাক্ষন দাদীর সাথে গুজগুজ, ফুসফুস, কাজের লোকদের ঘরের খোজ নেয়া, যত্তোসব। রেহানা সুলতানা ধমক দিয়ে বললেন, জলিলকে কিছু টাকা দাও, হয়তো ওর দরকার হতে পারে আর কান্না থামাও, এসব নিয়ে এতো কান্নার কি হলো? ওকে দু / এক দিনের ছুটি দিয়ে বিদায় করে দাও। হঠাৎ কান্না থামিয়ে টিয়ানা কঠিন গলায় বললো, মা, তুমি কি পারতে না রফেজার জন্য কিছু করতে? এজন্যই আমি তোমাকে এতো অপছন্দ করি মা, শুধু এজন্যই। টিয়ানার গলার কাঠিন্যতে কিছুটা থমকে গেলেন রেহানা সুলতানা। হঠাৎ মনে পড়ল হ্যা টিয়ানা বলেছিল বটে জলিলের মেয়ের একটা সমস্যার কথা, কিন্তু এসব চাকর বাকরদের ব্যাপার নিয়ে বসে থাকলেতো আর তার চলে না। মেয়েকে দিয়ে তার কাছে সুপারিশ পাঠানোতে রেহানা সুলতানা বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন আর জলিলকে ডেকে রীতিমতো ধমকেই দিয়েছিলেন সেজন্য। এখন এতো ব্যস্ততার মাঝে টিয়ানার সাথে বচসা করার সময় তার নেই তাই তিনি ফোন কেটে দিলেন।

টিয়ানা ওদিকে পাথর হয়ে ভাবছিল এতো কঠিন কি ছিল মায়ের জন্য রফেজার পাশে দাড়ানো? মা রফেজার পাশে যাননি কারণ রফেজা খবরের কাগজের শিরোনাম হয় নি, যেখানে ক্যামেরা নেই, প্রেস নেই সেখানে মা সময় নষ্ট আর করেন না আজকাল। মাঝে মাঝেই স্কুলে যাওয়ার পথে জলিল ড্রাইভারের সাথে কথা হতো

টিয়ানার। টিয়ানা ঘরের লোকদের খোজ খবর নিতো। তিন মেয়ে, দু ছেলে, মা আর বউ নিয়ে জলিল ড্রাইভারের সংসার। একদিন জলিল ড্রাইভারকে বেশ বিষন্ন মনে হচ্ছিল টিয়ানার, জিজ্ঞেস করেছিলো শরীর খারাপ করেছে কিনা? বাড়িতে কিছু হয়েছে কিনা? এমনিতে জলিল ড্রাইভার চুপচাপই থাকে কিন্তু সেদিন কেমন যেনো লাগছিলো টিয়ানার। জিজ্ঞেস করে জানলো বড় মেয়ে স্কুলে যায় পড়তে, পড়াশোনায় মোটামুটি সে খারাপ না। বিকেলে নিজের পড়ার ফাকে ফাকে টিউশনীও করে পাড়ার মধ্যে। বেশ অনেকদিন ধরেই পাড়ায় কিছু বখাটে তার মেয়েকে বিরক্ত করছিলো কিন্তু সেটা ছিল সহ্য সীমার মধ্যে। রফেজা মাথা নীচু করে চলে যেতো বলে সমস্যা আর বেশী দূর আগাতে পারেনি। এবার পৌরসভা নির্বাচনের জন্য কমিশনার পদপ্রার্থী ভদ্রলোক সেই বখাটেদেরকে তার পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন মোটা পয়সার বিনিময়ে। নির্বাচনের সময় বখাটেদের সন্ত্রাস ও মাস্তানীতে সেই ভদ্রলোক জয়ী হয়ে কমিশনার হয়ে গেলেন তার ওয়ার্ডের। ব্যাস বখাটেদেরকে আর পায় কে? কমিশনারের পোষা কুকুর হয়ে তারা কমিশনারের সর্ব ধরনের কাজে তাকে সাহায্য করে আর তার বিনিময়ে তারা পায় আইনের প্রশ্রয় আর মোটা টাকা। কমিশনারের খাস লোক হওয়াতে তাদের এখন এলাকা জুড়ে রাজত্ব, কে আটকায় তাদের। পুলিশও তাদের সমঝে চলে। হাতে কাচা টাকা থাকাতে দিনে দুপুরেই রাস্তায় মাতলামী
করে, বেলেল্লাপনা করে, বস্তির লোকজন তাদের চাদাবাজি আর অন্যান্য কাজে অতিষ্ঠ হলেও কোমড়ে গোজা ওই যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে
অসহায় চোখে চুপ করে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে। এতোদিন মেয়েদেরকে শীস দেয়া কিংবা নোংরা মন্তব্য আর ইঙ্গিত দেয়ার মধ্যেই বখাটেরা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কমিশনারের অবিরাম আশকারা তাদেরকে আরো বেপোরোয়া করে তুলল। সেদিন বিকেলে রফেজা যখন বাচ্চাদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল দুজন বখাটে তার হাত ধরে টানলে সে অতি কষ্টে তাদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে বাড়ি পালিয়ে এসেছে। যখন জলিল বাড়ি ফিরেছে রাতে বাবা বলে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে মেয়ে তার বুকে ছুটে এসেছে। বার বার কাদতে কাদতে বলছিলো বাবা আমাকে বাচাও। জলিলও দিশেহারা হয়ে ভাবছিলো কি করা যায়? এতো বড় সংসার নিয়ে কোথায় যাবে? গ্রামের বাড়িতেতো তেমন কিছু নেই উঠবেই বা কোথায় আর দিনের পর দিন খাবেই বা কি? অন্য বাচ্চারা মিউনিসিপ্যালটির স্কুলে যায় তাদেরই বা সে কি করবে? আইনের রাস্তাতো রুদ্ধ। অনেক ভেবে ঠিক করলো মেয়ের টিউশনীর দরকার নেই, স্কুলেরও দরকার নেই। বাসায় বসে বসে পড়বে আর প্রাইভেটে এস।এস।সি দিবে। প্রাইভেটে দিলেও মেয়ে পাশ করবে। মোট কথা মেয়ের বাড়ির বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। রাতে রফেজার মায়ের সাথে একান্তে বুদ্ধি করলেন এরমধ্যে দেখে শুনে একটা ভালো পাত্র দেখে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে এই এলাকা থেকে সরিয়ে দিবেন। আপাতত এভাবেই চলুক। কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তাতো আর দূর করতে পারলেন না। টিয়ানা শুনে বলেছিলো আপনি কিছু ভাববেন না ড্রাইভার সাহেব, মাকে আমি বলবো, মা সব ঠিক করে দিবে। মায়ের কতো চেনা জানা।

টিয়ানা রাতে মা বাড়ি ফিরতেই জলিল ড্রাইভারের মেয়ে রফেজার কথা বলতে লাগল, মা সব শুনে প্রচন্ড ধমক দিলেন আর বললেন ড্রাইভারের মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে নিজের পড়ায় মন দিতে। এসব ফালতু ব্যাপার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে। টিয়ানার জিদের কাছে পরাস্ত হয়ে শেষে বলেছিলেন কমিশনারের সাথে কিংবা থানার সাথে কথা বলে দেখবেন। রেহানা সুলতানা এসব ঘটনাকে যেহেতু বেশী গুরুত্ব দেন না, যথারীতি তিনি ভুলেও গেলেন আর নিজের কাজেই ব্যস্ত হয়ে গেলেন। সময়তো থেমে থাকে না। রফেজা গৃহবন্দী হয়ে ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইল। স্কুলের বন্ধু, পড়া, স্কুলের জীবন সবই ভুলে গিয়ে এই ছোট্ট ঘর, মায়ের কাজে সাহায্য, ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইল। কদিন থেকেই ছোট ভাইয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, সরকারী ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন কিন্তু তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। আজ সকালে মা কাজে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই ভাইয়ের শরীরটা অনেক খারাপ হতে লাগল, ভয় পেয়ে ভাইকে কোলে নিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ভাইকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরছিলো পথে রফেজা পড়ল সেই বখাটেদের কবলে। বখাটেরা বীর বিক্রমে এবার রফেজার উপর ঝাপিয়ে পড়ল, হাত ধরে টানাটানি, ওড়না ধরে টানাটানি, ছোট ভাই আর রফেজার ভর্যাত চিৎকারে পথের চারদিকে লোক জমে গেলো। সবাই দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছে রফেজার অপমানের কাহিনী কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসল না। ভয়ে সিটিয়ে দূরে দাড়িয়ে দেখল শুধু। বখাটেদের সাথে ধস্তাধস্তিতে কাপড় জামা

ছিড়ে, রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরল রফেজা। ভাইকে ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিল খুব শান্ত ভঙ্গীতে। তারপর সারাদিন ঘরের সব কাজ সারল চুপচাপ, কারো সাথে কোন কথা না বলে। আশে পাশের বাড়ি থেকে করুনা চোখে নিয়ে দু চারজন অবশ্য উকি দেয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রফেজাকে আজ যেনো কিছুই আর স্পর্শ করছে না। অপমানে সে যেনো আজ পাথর। দু চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে ছোট বেলা থেকে বড় হচ্ছে রফেজা। পড়াশোনা করবে, পরিবারের হাল ধরবে, ছোট ভাই বোনদের মানুষ করবে, সমাজে আর দশ জনের মতো মাথা উচু করে বাচবে। এই বস্তি থেকে দূরে কোথাও ছোট্ট একটা বাড়ি হবে তাদের যার চারপাশ থাকবে সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা, বাবা-মা, দাদী আর বোনেরা মিলে বৃষ্টির রাতে টিনের চালে ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ শুনবে। বস্তির এই নোংরা পরিবেশ থেকে অনেক দূরে থাকবে তারা, মুক্তি দিবে সে তার পরিবারকে এই পরিবেশ থেকে। অনেক অনেক অনেক আপোষ করেছিল রফেজা তার স্বপ্নের সাথে। বাড়ি থেকে বেরোন নিষেধ, পড়াশুনা মোটামুটি বন্ধ, টিউশনী করে সংসারের জন্য যা আনতো সে রাস্তাও বন্ধ কিন্তু তারপরও উদ্যম হারায়নি রফেজা। কিন্তু আজকের এই গ্লানি সে নিতে পারছিল না। এতো বড় কলঙ্ক মাথায় করে তাকে বাচতে হবে, সাথে তার পরিবারকেও??? রাতে বাবা যখন বাড়ি ফিরল, সব শুনল, বাবা-মেয়েরে জড়াজড়ি করে খুব কাদল, তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হলো, এক সময় অনেক রাতে সবাই শুয়ে পড়ল। ঘরের সবাই বুঝতে পারছিল কেউ ঘুমায়নি কিন্তু সবাই ঘুমের ভান করে পড়েছিল। ভোর রাতের দিকে সবাই বোধ হয় একটু তন্দ্রাতে জড়িয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙ্গল প্রতিবেশীদের চিৎকারে। ঘরের পাশের পেয়ারা গাছে নিজের গলার ওড়না পেচিয়ে ঝুলে আছে রফেজা। মাথা নীচু করে বাচার অপমান থেকে নিজেকে আর নিজের পরিবারকে চিরমুক্তি দিয়ে গেলো সে। মায়াবী চেহারার ষোড়শী রফেজা কি কুৎসিত ভঙ্গীতেই না এখন ঝুলে আছে।

জলিল জানতো আজ বেগম সাহেবার জরুরী দরকার হবে তাকে কিন্তু মেয়েকে অন্তিম শয্যায় ফেলে সে কি করে আসে। মেয়ে বেচে থাকতে তাকেতো ছায়া দিতে পারেনি, আজ মৃত্যুশয্যায় তাকে ছায়া দিয়ে রাখবে সারা বুক দিয়ে। যে পুলিশের কাছে জলিল নিজে কোনদিনও সাহস করে যেয়ে নালিশ জানাতে পারেনি, তারাই বাড়ি বয়ে এসেছে আজ রফেজার খোজ খবর নিতে, তার সাথে কথা বলতে। ওয়ার্ড কমিশনার সাহেবও এসেছেন তাকে সান্তনা দিতে, জোর গলায় বললেন অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে, এ মৃত্যু বৃথা যাবে না। সুরতাহাল করে মেয়েকে পুলিশ নিয়ে গেলো ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশকে জানতে হবে আজ এই মৃত্যুর রহস্য। রফেজার মা আর দাদী অনেক কান্নাকাটি করলেন, মাথা খুড়লেন পুলিশের কাছে রফেজাকে কাটাকাটি না করার দোহাই দিলেন, কিন্তু আজ পুলিশ কর্তব্যে অনড়। মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার পর জলিল বাড়ি থেকে বেরোলেন। তার পরিচিত আর কেউ বেগম সাহেবার বাড়ি চিনে না যে এসে খবরটা দিয়ে যাবে, তাই জলিল দুপুরে বেরিয়েছে বেগম সাহেবাকে তার অপারগতার খবর জানাতে। আসার সময় দেখল পাড়াটা কি অদ্ভুত শান্ত আজকে, যেখানে বেঞ্চিতে বসে সেই ছেলেগুলো আড্ডা দিতো সে বেঞ্চিটা আজ বড় বেমানান ভাবে খালি পড়ে আছে, আর চায়ের দোকানেও যেনো লোক কম। যারা আছে তারা কেউ তার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না, কেমন যেনো চোরা চোখে তাকে দেখছে। জলিল সাহেব আছেন ভাবলেশহীন। হয়তো ভিতরে ভিতরে সারাক্ষন ভেবে যাচ্ছিলেন বাবা হয়ে সন্তানকে সামান্য একটু নিরাপত্তাও যে দিতে পারলেন না, এই অপরাধ তার মেয়ে ক্ষমা করবেতো? শান্ত ধীর স্থির পদক্ষেপে তিনি যাচ্ছিলেন তার বেগম সাহেবার বাড়ির দিকে। বেগম সাহেবাও জানুক জলিলের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, কারো সুপারিশের আজ আর প্রয়োজন নেই।

নারী দিবসের সফল সেমিনারের আবেশ তখনও মনে গুন গুন করছে রেহানা সুলতানার, তাই রফেজার মতো নিতান্ত অবহেলিত কারোর এই করুন মৃত্যুর খবর মনে কোন রেখাপাত করল না । অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী, তিনি অনুষ্ঠান শেষে বলে গেলেন তার স্পীচ খুবই চমৎকার হয়েছে। সামনের আন্ত র্জাতিক নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে তার স্থান নিশ্চিত। একথা শোনার পর থেকে মনটা সে আমেজেই অনেকটা চাঙ্গা। তাছাড়া হাতে অনেক কাজ আরো বাড়ল বৈকি। মন্ত্রী মহোদয় হয়তো ভুলেই যাবেন তার কথা শত কাজের ভীড়ে, তাকে মনে করিয়ে রেখে রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাওয়ার পয়গাম নিশ্চিত করার হ্যাপাই বা কম কিসে? এই সূযোগটার জন্য কি রেহানা সুলতানা কম চেষ্টা করে চলেছেন আজ কবছর ধরে? কম কাঠখড় পোড়াচ্ছেন? অবশেষে সেই সোনার হরিনের নাগাল মিললো বলে মনে হচ্ছে। সোসাইটিতে

খবরটা চাউর হওয়ার থ্রীলই হবে আলাদা। স্বপ্নে বিভোর হয়ে বারান্দার রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন কালকের নিউজ পেপারে তার স্পীচটা কি ঢং এ আসবে সেই কল্পনায়।

তানবীরা তালুকদার
০৭।০৩।০৭